❐ **টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগে জাপানের রাজনৈতিক কাঠামো ঃ** টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগের রাজনৈতিক কাঠামো বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই সময় রাজতন্ত্র টিকে ছিল । কোন শোগুন সম্রাটকে সরানোর কথা ভাবেননি । ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর সম্রাটের নৈতিক প্রভাব ছিল । শাসনের ক্ষমতা শোগুনের হাতে চলে গিয়েছিল । সম্রাট থাকতেন কিয়োটো-তে, আর শোগুনের সদর দপ্তর ছিল ইয়েডো (টোকিও) এবং শোগুনের জমিদারি ছিল তেনরিও-তে । শোগুনের শাসনকে বলা হয় 'বাকুফু', যার অর্থ হল শিবির অফিস । টোকুগাওয়া শাসকরা সব সময় নিজেরা দেশ শাসন করতেন না, তাদের হয়ে উপদেষ্টারা শাসন পরিচালনা করতেন । টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের সকলে দক্ষ শাসক ছিলেন না, এজন্য তাদের শাসনের শেষদিকে শাসন কাঠামোর ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়েছিল।

শোগুনতন্ত্র জাপানে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে শান্তি স্থাপন করেছিল । শোগুন ছিলেন ডাইমোদের মধ্যে প্রধান, তিনি নিজে তেনরিও হানের মালিকানা ভোগ করতেন । ইয়েডো সহ কয়েকটি বাণিজ্য কেন্দ্রও তিনি নিজের অধিকারে রেখেছিলেন । বাকি জমি ২৮০ জন ডাইমোদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয় । ডাইমোরা তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলেন-- সিমপান, ফুদাই ও তোজামা । সিমপান ডাইমোরা শোগুন পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । ফুদাই হল অনুগত বংশানুক্রমিক ডাইমো এবং বাকিরা হল তোজামা, এরা সেকিগাহারা যুদ্ধের পর টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল, এদের আনুগত্য সন্দেহাতীত ছিল না । শোগুন দেশে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য একটি জটিল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গঠন করেছিলেন ।

ডাইমোরা শোগুনের অনুমতি না নিয়ে নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারত না । ডাইমো নতুন প্রাসাদ বানাতে চাইলে তাকে শোগুনের অনুমতি নিতে হত । রাজধানীতে শোগুনের নিয়মবিধি মেনে চলার জন্য ডাইমোদের প্রচুর ব্যয় হত, তাই তারা অনেক সময় বণিকদের কাছ থেকে টাকা ধার করতে বাধ্য হত । আবার শোগুন নানা অজুহাতে ডাইমোদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতেন । এসবের অবশ্য কারণ ছিল, শোগুনদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ডাইমোরা যেন প্রচুর সম্পদের মালিক না হয় । কোন ডাইমো সরাসরি সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে পারত না । শোগুনের কর্মচারিরা সম্রাটের আবাসস্থল কিয়োটোর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত । টোকুগাওয়া সরকার দেশে একটি শক্তিশালী গুপ্তচর ব্যবস্থা গঠন করেছিল । তবে এতসব বিধিনিষেধ সত্ত্বেও ডাইমোরা তাদের জমিদারিতে যথেষ্ট স্বশাসনের অধিকার ভোগ করত ।

শোগুনের শাসন পরিচালনার জন্য দুটি সভা ছিল- কাউন্সিল অব এল্ডার্স ও জুনিয়র কাউন্সিল । এরা শোগুনের হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করত । সারা দেশ ডাইমোতে বিভক্ত ছিল, ডাইমো আবার প্রদেশ, জেলা, শহর ও গ্রামে ভিভক্ত ছিল । প্রাদেশিক ও জেলা শাসক কর ধার্য ও কর সংগ্রহের কাজ করত, সামুরাইরা এই শাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । শোগুনের যুগে বিচারব্যবস্থা ছিল সহজ ও সরল, সালিশির মাধ্যমে বেশিরভাগ বিরোধের মীমাংসা করা হত । দেশে তিন ধরনের আদালত ছিল--জেলা, শহর ও ধর্মীয় আদালত, ইয়োডো-তে হাইকোর্ট ছিল ।

পরিশেষে, শোগুনের শাসন প্রকৃতিগত দিক থেকে সামন্ততান্ত্রিক, তবে এই সামন্ততন্ত্র ছিল অনেকখানি কেন্দ্রীভূত । এই শাসনের ফল হল যোদ্ধা সামুরাই নিয়ন্ত্রিত, শান্তিপূর্ণ, স্তর বিন্যস্ত । শোগুনরা নিজেদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন । কিন্তু একাধিপত্য স্থাপন করা সম্ভব হয়নি । শোগুনরা সর্বদা বিদ্রোহের ভয়ে ভীত থাকতেন, প্রায় ৩০০জন ডাইমোদের মধ্যে তোজামা ডাইমো শোগুনের প্রতি নিঃশর্ত, অবিচল আনুগত্য কখনও প্রকাশ করেনি । জাপানের এক বিশাল অঞ্চলে এদের আধিপত্য ছিল । তাই শোগুনরা বিদেশিদের কাছ থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন ।

❐ **প্রাক মেইজি যুগের জাপানের সামাজিক স্তর-বিন্যাস ঃ** প্রাক মেইজি যুগে জাপানের সামাজিক স্তর বিন্যাস সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয় রুশ ক্যাপ্টেন ভ্যাসিলি গ্যালোওনিন-এর স্মৃতিকথায় । গ্যালোওনিন রুশ সামরিক অফিসার রেজনভের সহযোগী হিসাবে জাপানি গ্রামে আক্রমণ চালালে তাঁকে বন্দি করা হয় । তিন বছরের বন্দিজীবনের স্মৃতিকথা গ্যালোওনিন 'মেমোরিজ অফ ক্যাপটিভিটি ইন জাপান' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন । তাঁর গ্রন্থ থেকে সমসাময়িক জাপানের সামাজিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় । জাপানে মোট ৫টি সামাজিক শ্রেণির অস্তিত্বের কথা জানা যায় । যথা- ক) ডাইমো, খ) সামুরাই, গ) কৃষক, ঘ) কারিগর ও ঙ) বণিক ।

ক) ডাইমো ঃ টোকুগাওয়া জাপানের সামাজিক ক্ষেত্রে সবার শীর্ষে ছিলেন ডাইমো শ্রেণি । শোগুনেরা শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে এই ডাইমোদের ওপর নির্ভর করতেন । ডাইমোরা ছিলেন বৃহৎ ভূস্বামী ও নিষ্কর জমির মালিক । জমিদারির আয়তন ও সম্পত্তির পরিমাণ অনুযায়ী তাদের স্তর বিন্যাস করা হত । ডাইমোরা নিজস্ব এলাকাতে স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত বেশকিছু অধিকার ভোগ করতেন । তারা স্ব-এলাকায় স্বাধীন ভাবে থাকতেন, কর আদায় করতেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতেন, অপরাধের বিচার করতেন । তাঁরা নিজস্ব সৈন্যবাহিনি রাখতেন । এইসব অধিকার ভোগ করার বিনিময়ে তাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হত । শোগুনকে প্রয়োজনে সৈন্য দিয়ে সাহায্য, দাবি মত অর্থ ও নজরাণা প্রদান এবং রাজধানী ইয়োডোতে বাসস্থান নির্মাণ করতে হত ।

খ) সামুরাই ঃ জাপানের সমাজে পেশাদার যোদ্ধা শ্রেণিকে বলা হত 'সামুরাই'। সামাজিক কাঠামোয় সামুরাইদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দেশের মোট জনসংখ্যার ১/৬% এই শ্রেণির অর্ন্তগত ছিল । তরবারি ছিল এদের প্রতীক । দ্বাদশ শতকে যখন মিনামোটা ও তায়রা গোষ্ঠীর মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তখন এই সামুরাইদের উদ্ভব হয়েছিল । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আসে । প্রথমদিকে তারা যুদ্ধ ছাড়াও কৃষি কাজ করত । কিন্তু পরবর্তীতে যুদ্ধ বৃদ্ধি পাওয়ায় ও রণকৌশল জটিল হয়ে পড়লে পেশা হিসাবে সামুরাইদের কেবল যুদ্ধকে বেছে নিতে হয় । কেউ গ্রামীণ শাসনের সঙ্গে, কেউ আর্থিক ব্যবস্থায়, কেউ সংবাদ সরবরাহ, কেউ বা দুর্গ রক্ষা করতেন । সামুরাই-রা ছিলেন অত্যন্ত শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান । তাদের সংহতির নীতি মেনে চলতে হত, যা 'বুশিডো' নামে পরিচিত ।

গ) কৃষক ঃ টোকুগাওয়া যুগে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণি ছিল কৃষক সম্প্রদায় । মোট জনসংখ্যার ৮২% ছিল কৃষক শ্রেণি । তাদের শ্রমের ওপরেই দাঁড়িয়েছিল কৃষি কাঠামো । সাধারণত জাপানে আবাদি জমির আয়তন ছিল অর্ধেক 'চো', যা আড়াই একর জমির সমান । কৃষকরা খুব যত্ন করে চাষ করত, তাঁরা ধান, যব, গম, তৈলবীজ, শাকসব্জী, চা চাষ করত । তাদের কাছে মুদ্রা সব সময় থাকত না বলে মহাজনদের খপ্পরে পড়ে নিস্বঃ হত । বলা যায় জাপানি কৃষকের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না । কৃষক আবার দুধরনের ছিল-- ক) হাইয়াকুশো বা জমির মালিক ও খ) গোনিন বা ভূমিহীন কৃষক, এদের অবস্থা ছিল শোচনীয় । রবীন্দ্রনাথ জাপানি কৃষক সম্পর্কে বলেছেন, 'স্ফীতকায় অপমান অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান, লক্ষ মুখ দিয়া বেদনারে করিতেছে পরিহাস স্বার্থোদ্ধত অবিচার ।' অনাহারের জন্য কৃষক তাঁদের সন্তানকে হত্যা করছে এমন দৃশ্যও দেখা গেছে ।

ঘ) কারিগর ঃ টোকুগাওয়া যুগে কারিগররা ছোট ছোট শিল্পে নিযুক্ত থাকতেন । শিল্পী স্থপতি থেকে আরম্ভ করে মিস্ত্রী, ছুতার ও তাঁতি সকলেই কারিগর শ্রেণির অর্ন্তগত ছিল । শিল্পী ও স্থপতিরা বিশেষ মর্যাদা পেতেন । ক্ষুদ্র হস্তশিল্পকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গিল্ডগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত । উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নতি, শিল্পজাত পণ্য বিক্রি করার যাবতীয় দায়িত্ব গিল্ডগুলি গ্রহণ করত ।

ঙ) বণিক ঃ সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে জাপানে সবার নীচে ছিল বণিক শ্রেণি । কনফুসীয় দর্শন অনুসারে বণিকদের হীন চোখে দেখা হত । বণিকরা কৃষকদের চড়া সুদে ঋণ দিতেন বলে তাদের ঘৃণার চোখে দেখা হত । তবে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আর্থিক নীতির পরিবর্তন বণিক শ্রেণিকে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণিতে পরিণত করেছিল । বাণিজ্যের প্রসারে বণিকরাও কারিগরদের মত কতকগুলি গিল্ড গঠন করেন । এই গিল্ডগুলি পরিচিত ছিল 'টোকুমিদোন্যা' নামে । তাছাড়া বণিকদের উদ্যোগে বণিকসভা বা 'কাবুনাকামা' গড়ে উঠেছিল । ইয়েডো ও ওসাকা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল । এসবের ফলে বণিক শ্রেণির মর্যাদা অনেকটা বৃদ্ধি পায় ।

❐ টেম্পো সংস্কার ঃ টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের শাসনের শেষদিকে জাপানের আর্থিক পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে । সরকারের আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমতা ছিল না । যত দিন যাচ্ছিল সরকারের আয় কমছিল এবং ব্যয়ের পরিমাণ বেড়েই চলেছিল । এর পরিণামে কৃষকদের ওপর কর চাপানো হয়েছিল । ব্যাবসা-বাণিজ্যে মন্দা এসেছিল । বাজেটে ঘাটতিকে মেটানোর জন্য সরকার বেশিমাত্রায় মুদ্রা বাজারে ছেড়েছিল । ফলে পণ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে গিয়েছিল । সাধারণ মানুষ বিপদের চরম সীমায় পৌছেছিল । পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য শোগুনতন্ত্র প্রশাসনিক ও আর্থিক সংস্কারের চিন্তা করেছিল । এই পরিস্থিতিতেই জাপানে শুরু হয় 'টেম্পো সংস্কার' ।

'টেম্পো সংস্কার' বলতে কী বোঝায় সে প্রসঙ্গে আলোচনা করলে দেখা যায়, টেম্পো সংস্কারের সঙ্গে মিজুনো-তাদাকুনি নামক ব্যক্তি বিখ্যাত হয়ে আছেন । ১৮২৫ সালে তিনি ওসাকা দুর্গের গর্ভনর হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন । এই সফল প্রশাসক শোগুনের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন । ১৮৪১-১৮৪৩ সাল পর্যন্ত কয়েকটি আদেশ জারি করে তিনি প্রশাসনিক ও আর্থিক সঙ্কট থেকে জাপানকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন । শোগুন প্রশাসনের সামনে তখন বড় সমস্যা ছিল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি । জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল । জাপানিদের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত । চালের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য চাল দাঙ্গা হয়েছিল । নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি ।

১৮৩৯-৪১ সালে নতুন মুদ্রা অর্থনীতির বিস্তার হয়েছিল । সরকার সোনা, রূপা ও তামার মুদ্রার সরবরাহকে বাড়িয়েছিল । কৃষক ও শ্রমিক কৃষি ও কুটির শিল্প থেকে প্রচুর অর্থ পেয়েছিল । কিন্তু দ্রব্যমূল্য বহুগুণ বেড়ে যাওয়ার জন্য তাদের কিছু লাভ হয়নি । মুদ্রার মূল্য ক্রমশ কমে গিয়েছিল, সরকার মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি করেছিল । তাই বাজেটে ঘাটতি পূরণ করে সমতা ফেরানোর জন্য মুদ্রার সরবরাহকে বাড়িয়েছিল । কিন্তু পণ্যদ্রন্যের মূল্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়নি । কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়েনি, শিল্প ও বাণিজ্যে বিনিয়োগ বেড়েছিল । কৃষকরা চিরাচরিত কৃষিকাজে আর থাকতে চায়নি । তারা কৃষি ছেড়ে শিল্প শ্রমিক হিসাবে কাজ করেছিল । স্বাভাবিকভাবে শোগুনের আয়ের মূল উৎস কৃষি থেকে রাজস্বের পরিমাণ কমে গিয়েছিল ।

এহেন সঙ্কট মোকাবিলায় ১৮৪১ সালে শোগুনের জন্মদিনে বাকুফু বা শোগুনতন্ত্রের সংস্কারের উদ্দেশ্যে কতকগুলি ঘোষণা হয়েছিল । আদেশ বা ঘোষণায় বলা হয়েছিল কৃষক জমি ছেড়ে যেতে পারবে না । এমনকি গ্রাম ছেড়ে শহরে শিল্পশ্রমিক হিসাবে কাজ করতে পারবে

না । পর পর কয়েক বছর এই ঘোষণাকে কার্যকরী করা হয়েছিল । কিন্তু তাহলেও দেখা যায় শোগুনতন্ত্রের এই নির্দেশ কৃষকরা মান্য করেনি । কৃষক চিরাচরিত কৃষিকাজের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেনি । অবশ্য শোগুন ব্যয় কমিয়ে বাজেটে ঘাটতি পুরণের চেষ্টা করেছিল । বিলাসবহুল পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল । ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা থেকে মুক্ত ছিল না । আসলে জাপানের বণিকরা ইয়েডো-কেন্দ্রিক এবং একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে ছিল । অথচ শোগুনতন্ত্র একচেটিয়া বাণিজ্যকে সামনে রেখে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে চেয়েছিল ।

দেখাগেছে ১৮৪৩ সালের প্রথমদিকে শোগুন ডাইমোদের আর্থিক ক্ষেত্রে দুর্বল রাখার নীতি গ্রহণ করে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছিল । ডাইমোরা যে কাগজের মুদ্রা চালু করেছিল শোগুন তার ওপরে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন । নিজেদের এলাকার বাইরে পণ্য কেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছিল । শোগুনতন্ত্র শিল্প-বাণিজ্যের ওপরে প্রভূত্ব কায়েম রাখার চেষ্টা করেছিল । শিল্প-বাণিজ্যের ওপর ডাইমোদের যে প্রাধান্য ছিল শোগুনতন্ত্র তাকে মানতে পারেনি । যাইহোক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনার জন্য শোগুনতন্ত্র আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিল । ডাইমোদের আয় কমানোর জন্য দ্রব্য মূল্য ২০% কমানো হয়েছিল, কৃষিকে গুরুত্ব দিয়েছিল, কৃষককে কৃষিমুখী করা হয়েছিল ।

ইতিহাস দেখিয়েছে, এতসব করেও শোগুনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল । কৃষকরা কৃষিকাজ ছেড়ে শহরে চলে গিয়েছিল, ইয়োডো শহরে দ্রব্যমূল্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হলেও বণিকরা অন্যত্র পণ্য সরবরাহ করেছিল । সুদের হার কমিয়ে জনগণকে আর্থিক দিক দিয়ে কিছু সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল । কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি, বরং পুঁজির যোগান কমে গিয়েছিল । শোগুনতন্ত্র বণিকদের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছিল । সবচেয়ে বড়কথা এই যে টেম্পো সংস্কারের প্রধান মিজুনো ডাইমোদের বিরোধিতার জন্য সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত হয়েছিলেন । পরে তিনি স্বপদে বহাল হলেও কোন আর্থিক সংস্কারের চেষ্টা করেননি । কাজেই আমরা দেখতে পাই উনিশ শতকের প্রথমদিকে জাপানের অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবিলায় টেম্পো সংস্কারের দ্বারা যেসব সংস্কার কার্য করা হয়েছিল, তা কোন কাজেই লাগেনি । বরং এতে শোগুনতন্ত্রের ভিত আরও শিথিল হয়ে পড়েছিল ।

❐ মেইজি রেস্টোরেশন ঃ টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের শেষ দিকে অর্থাৎ উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে কিয়োটোর রাজ দরবারে একটি শোগুন বিরোধী গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল । শোগুনতন্ত্রের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে রাজতন্ত্রের সমর্থক এই প্রভাবশালী চক্র রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি করার বিষয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল । শোগুন যখন বহিঃচাপের মুখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন এই গোষ্ঠী শোগুন বিরোধী আন্দোলন শুরু করে । তাঁরা 'সোন্নো-জো-ই' (সম্রাটকে সমর্থন কর ও বিদেশিদের বিতাড়িত কর) শ্লোগান তুলে বিদেশির হাতে জাপানকে তুলে দেবার বিরোধিতা করেন । কিন্তু শোগুনতন্ত্রের সমর্থক গোষ্ঠী পাশ্চাত্য দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন ।

বিদেশিরা সাতসুমা ও চোসু গোষ্ঠীকে বিপর্যস্ত করার ফলে প্রমাণিত হয় যে বিদেশিদের প্রতি শোগনুতন্ত্রের নীতিই সঠিক । এই সময় থেকেই জাপানে উগ্র বিদেশি বিরোধিতার যবনিকা ঘটে । কিন্তু তা সত্ত্বেও শোগুন বিরোধী আন্দোলন অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলে । শোগুন বিরোধী চক্র শোগুনতন্ত্রের ও বাকুফু শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়াস চালিয়ে যায় । সবচেয়ে বড় কথা, বহু দিন ধরেই সাতসুমা ও চোসু গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক ছিল তিক্ত । অথচ শোগুন বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ১৮৬৬ সালে এই দুই গোষ্ঠী গোপনে মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয় ।

বিরোধী গোষ্ঠী হিসাবে আরও দুটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিজেন ও তোসার সঙ্গে হাত মেলায় । সম্রাট কোমেই এবং কিয়োটা রাজপ্রাসাদের অভিজাতরা বাকুফু বিরোধী জোটের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন । তাছাড়া ওসাকা অঞ্চলের ধনী বণিক গোষ্ঠী, বিশেষত মিৎসুই পরিবার শোগুন বিরোধীদের প্রচুর অর্থসাহায্য করেছিল । সম্রাটকে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হতে থাকে । এই অবস্থায় তোসা গোষ্ঠীভূক্ত কিছু ব্যক্তি সাতসুমা ও চোসু গোষ্ঠীর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আশঙ্কিত হয়ে প্রস্তাব দেন যে শোগুন যদি স্বেচ্ছায় তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা পরিত্যাগ করেন, তবে নতুন ব্যবস্থায় তাঁকে সম্মানজনক স্থান দিতে হবে । রিচার্ড স্টোরির মতে, তোসা নেতারদের এই নীতি ছিল বিচক্ষণ ও উদার, এই নীতি গৃহীত হলে অনেক রক্তপাত বন্ধ হবে । কিন্তু চোসু ও সাতসুমা নেতাদের আগ্রাসী নীতির ফলে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় ।

চোসু ও সাতসুমা নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল শোগুনের রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান । তাঁরা এখানেই থেমে না থেকে শোগুনের সম্পত্তি গ্রাস করতেও উদ্ধত হয়ে উঠেছিলেন । তৎকালীন ব্রিটিশ মন্ত্রী স্যার হ্যারি পার্কস উপলব্ধি করেছিলেন যে পশ্চিমী গোষ্ঠীগুলি ভবিষ্যৎ জাপানের শাসক হতে চলেছে । তাই তিনি এই গোষ্ঠীগুলির তরুণ ও উগ্রপন্থী নেতাদের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন । সকলের মুখেই রটনা রটতে থাকে যে গ্রেট ব্রিটেন সম্রাটের অধীনে সমগ্র জাপানকে ঐক্যবদ্ধ করতে আগ্রহী । অন্যদিকে ফ্রান্স আবার শোগুনতন্ত্রের

পক্ষ গ্রহণ করে । ফরাসি মন্ত্রী লিয়ঁ রোচেস শোগুনতন্ত্রকে সমর্থন করেন । প্রকৃতপক্ষে ১৮৬০-এর দশকে শোগুন এবং ফ্রান্সের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সাতসুমা ও চোসু নেতাদের শোগুন বিরোধিতাকে আরও উগ্র রূপ দিয়েছিল ।

সাতসুমা ও চোসু নেতাদের তীব্র শোগুন বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বশেষ শোগুন যোশিনেবু কেইকি ১৮৬৭ সালের নভেম্বরে সম্রাটের হাতে যাবতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পণ করেন । কিন্তু উগ্রপন্থী সাতসুমা ও চোসু নেতারা আদৌ সন্তুষ্ট ছিলেন না । ১৮৬৮ সালের ৩রা জানুয়ারি তাঁরা কিয়োটো-তে শোগুনের প্রাসাদ আক্রমণ করেন এবং সম্রাটের রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন । এই ঘটনাই জাপানের ইতিহাসে 'মেইজি রেস্টোরেশন' বা মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা নামে বিখ্যাত । তৎকালীন সম্রাট কোমেই-এর এই সময় মৃত্যু হলে নতুন জাপানি সম্রাট হলেন ১৫ বছরের তরুণ কিশোর মুৎসুহিতো । তাঁর সুদীর্ঘ ৪৫ বছরের শাসনকালের মধ্যে জাপান বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিল এবং একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল ।

===00===